ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় এবং ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের প্রথম দশক - জহর সরকার

*Name **

The Wire পত্রিকায় প্রকাশিত মূল প্রবন্ধটি ইংরেজি থেকে অনুবাদ করেছেন পল্লবী মজুমদার

১৯৪৮ থেকে ১৯৬২ অবধি পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় আজ থেকে ঠিক ৫৯ বছর আগে জুলাইয়ের এই প্রথম দিনে কলকাতায় তাঁর বাসভবনে প্রয়াত হন। তাঁর সুশৃঙ্খল স্বভাব, নির্ভুলতা, যুক্তিবাদ এবং বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির জন্য তিনি সাধারণের কাছে বহুল জনপ্রিয় এক নেতা ছিলেন। পৃথিবীতে প্রবেশ ও প্রস্থানের দিনটিকে এক রেখে, কীভাবে ঠিক আশি বছর বয়সে নিজের প্রস্থানমুহূর্তটি বেছে নিয়েছিলেন তিনি, তা তাঁর গুণমুগ্ধদের কাছে অনেকখানি অবাক করে দেওয়া এক বিরল ঘটনা নিশ্চয়ই।

সেই সময়কার এবং তৎপরবর্তী যে সব মুখ্যমন্ত্রীরা ভারতে রাজ্যশাসন করেছেন দীর্ঘ সময় ধরে, যেমন গোবিন্দবল্লভ পন্থ, কে কামরাজ, তাঁদের প্রতি সাধারণের একপ্রকার মুগ্ধতা আছে। তার একটা প্রধান কারণ হয়তো এটাই, যে তাঁদের প্রত্যেকের একটা নিজস্বতা ছিল, এবং তাঁরা তাঁদের মতন করে, জনস্বার্থে রাজ্য পরিচালনা করতেন।

-- Advertisements --

[cky_video_placeholder_title]

ভারতের যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামো তখন সবে দানা বাঁধছে একটু একটু করে, ফলে রাজ্যস্তরে অনেক কিছুই খানিকটা নড়বড়ে, সান্দ্র অবস্থায় ছিল। এক এক রাজ্যের এক এক মাপ, আকার, ভাষা, লোকাচার। ফলে গঠনগত দিক থেকে কিছুটা কেন্দ্রাভিমুখী হলেও সেটাকে মোটামুটিভাবে একটা যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোই বলা যায়। তার মুখ্য কারণ হল, ততদিনে এইটা বেশ স্পষ্ট হয়ে গিয়েছে, যে ভারতের মতো বিপুলায়তন, অগণিত বৈচিত্র্য এবং বিবিধতার দেশ ঐকিক রাষ্ট্রব্যবস্থায় (Unitary system of governance) শাসন করা প্রায় অসম্ভব।

ফলে কেন্দ্র এবং তার শরিকদের জন্যেই প্রয়োজন ছিল কিছু এলাকাভিত্তিক নিয়মকানুন এবং আচরণবিধির। কেন্দ্রীয় সরকারের বলবৎ করা ‘অ্যাক্টস অ্যান্ড রুলস’ ভারতের প্রত্যন্ত প্রান্তে প্রান্তে আর খাটছিল না। জহরলাল নেহরু অবশ্য এই ব্যবস্থাতেই ‘ফার্স্ট অ্যামং ইক্যুয়ালস’ হিসেবে নিজের উদারপন্থী-গণতান্ত্রিক ইমেজ তৈরি করেছিলেন এবং সেটা পরিস্থিতির সঙ্গে বেশ খাপও খেয়ে গিয়েছিল। তবে তাঁর সুদৃঢ় ভাবনাচিন্তা এবং সুদীর্ঘ নেতৃত্বের ফলে অচিরেই তিনি অন্যান্য নেতৃবর্গের চেয়ে অনেকটা উঁচুতে নিজের জায়গা পাকা করে ফেলেছিলেন।

মুখ্যমন্ত্রীর কুর্সিতে আসীন

কিন্তু ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের ব্যাপারটা খানিকটা অন্যরকম ছিল। যে ক'জন মুষ্টিমেয় প্রাদেশিক নেতা নেহরুর ব্যক্তিত্বের সামনে বিহ্বল এবং ক্ষুদ্র বোধ করতেন না, বিধানবাবু ছিলেন তাঁদের অন্যতম। বরং প্রধানমন্ত্রী হিসেবে নেহরুর নানা কার্যকলাপের মধ্যে নিজের বুদ্ধিমত্তার প্রয়োগে বিধিনিষেধ আরোপ এবং ভারসাম্য আনার কাজে তাঁর বিশেষ সুনাম ছিল। তবে সেকালের রাষ্ট্রব্যবস্থায় সেটা কতটা সম্ভব ছিল, এবং সত্যিই কতটা তিনি করতে পারতেন, আর কতটা তাঁকে ঘিরে গড়ে ওঠা মিথ, সে ইতিহাসটা আমাদের আরও একটু খতিয়ে দেখা দরকার । কারণ বর্তমানে আমরা এমন এক শাসনব্যবস্থায় বাস করি, যেখানে প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য উদ্দেশ্য হল মুখ্যমন্ত্রীদের উপর ছড়ি ঘোরানো, সে তিনি যে দলেরই সদস্য হোন না কেন। অথচ সেই পঞ্চাশের দশকে বিধানচন্দ্র যখন বক্তৃতা করতেন, সাধারণ মানুষ বিস্ময়ে হতবাক হয়ে শুনত যে তিনি প্রধানমন্ত্রীকে নাম ধরে সম্বোধন করছেন, এমনকী 'পণ্ডিতজি' বলেও নয়। সে আন্তরিকতা, সেই বিশ্বাস ও সৌহার্দ্য হয়তো এ দেশ আর ফিরে পাবে না।

-- Advertisements --

[cky_video_placeholder_title]

একথা মনে রাখা দরকার, যে বিধান রায়ের শক্তির উৎস ছিল তাঁর পেশাগত দক্ষতা—রাজনৈতিক হিসেবে নয়—চিকিৎসক হিসেবে। নেহরুর বাবার আমল থেকে গান্ধী পরিবারের চিকিৎসক ছিলেন বিধানচন্দ্র। চিকিৎসা করেছেন স্বয়ং গান্ধীরও। ফলে সেই ক্ষমতাবলেই যখন তখন নেহরুর ঘরেও অনায়াসে ঢুকে পড়তে পারতেন তিনি। তার ওপর বয়সে বিধানচন্দ্র ছিলেন নেহরুর চেয়ে বছর সাতেকের বড়। দু'জনেই পড়াশোনা করেছিলেন বিলেতে এবং ঘটনাচক্রে প্রায় একই সময় নাগাদ (১৯১১-১২) দেশে ফেরেন। বিধানচন্দ্রের দখলে ছিল রেকর্ড সময়ে পরপর (দু'বছর তিন মাস) দু'টি অতি মূল্যবান ডাক্তারি ডিগ্রি— এমআরসিপি এবং এফআরসিএস— লাভ করার বিরল কৃতিত্ব। ভারতে তো বটেই, বিলেতেও। ফলে চিকিৎসক হিসেবে তাঁর সম্মান ছিল অনতিক্রম্য।

ব্যারিস্টার নেহরুও বিধানচন্দ্রের কৃতিত্বে মুগ্ধ ছিলেন। কিন্তু ১৯২৫ সালের আগে পর্যন্ত তাঁকে রাজনীতিতে আসার জন্য রাজি করাতে পারেননি। ততদিন পুরোদমে ডাক্তারি করে গিয়েছেন বিধান রায়। ১৯২৫ সালেই প্রথম বিধানচন্দ্র ভোটে দাঁড়ালেন ব্যারাকপুর বিধানসভা কেন্দ্র থেকে, এবং হারালেন এমন একজনকে, যিনি সুপরিচিত ছিলেন 'দ্য গ্র্যান্ড ওল্ড ম্যান অফ বেঙ্গল' নামে— রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। ব্রিটিশরা যাঁর নাম দিয়েছিল 'সারেন্ডার-নট'। কংগ্রেস থেকে বেরিয়ে এসে মতিলাল নেহরু, চিত্তরঞ্জন দাশ, বিঠঠলভাই পটেল যে 'স্বরাজ পার্টি' তৈরি করেছিলেন, ভোটে জিতে প্রাথমিকভাবে বিধানচন্দ্র সে দিকেই ঝুঁকেছিলেন। কিন্তু অচিরেই স্বরাজ পার্টি ও কংগ্রেসের বিবাদের মীমাংসা হয়ে যাওয়ায় বিধানচন্দ্র সগর্বে জাতীয় কংগ্রেসের মূলস্রোতে প্রবেশ করেন।

১৯৪৮ সালে বিধানচন্দ্রকে মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শপথবাক্য পাঠ করাচ্ছেন তৎকালীন রাজ্যপাল রাজাগোপালাচারী

সুভাষচন্দ্র বসু তখন বারংবার জেলে যাচ্ছেন। এমনই এক সময়ে গান্ধীর ডাকে অসহযোগ আন্দোলনে যুক্ত হলেন বিধানচন্দ্র। বাংলায় গড়ে তুলতে লাগলেন প্রতিবাদ। তাঁর কর্মকুশলতায়, সাফল্যে মুগ্ধ হয়ে মতিলাল নেহরু তাঁকে কংগ্রেস ওয়র্কিং কমিটির সদস্য হিসেবে মনোনীত করলেন। প্রসঙ্গত, বিধানচন্দ্র কিন্তু চিকিৎসা পেশা ছাড়েননি। কারণ নিজের 'কিংবদন্তী চিকিৎসক'-এর যে ইমেজ তিনি গড়ে তুলেছিলেন, তাকে কংগ্রেসের জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে কাজে লাগাবার ইচ্ছে তাঁর ছিল। কংগ্রেস হাইকমান্ড এরপরেই তাঁকে কলকাতা পুরসভার মেয়র পদে বসায়। দলাদলি আর গোষ্ঠীদ্বন্দ্বে জর্জরিত বাংলার প্রদেশ কংগ্রেসকে চূড়ান্ত কুশলতায়

ঐক্যবদ্ধ করার কাজ শুরু করেন বিধানচন্দ্র এবং শুরু করেন এমন এক সময়ে, যখন নেতাজি সুভাষচন্দ্র ছিলেন সে দলের সক্রিয় সদস্য।

সুভাষচন্দ্রের চেয়ে বিধানচন্দ্র ছিলেন পনেরো বছরের বড়। এ ব্যাপারটা বর্তমান রাজনীতিতে কোনও গুরুত্ব না-পেলেও সেকেলে সনাতনী রাজনৈতিক আদর্শে যথেষ্ট গুরুত্ব পেত। তদুপরি, বিধানচন্দ্র ছিলেন রাজনীতির পাকা কৌশলী। ফলে গান্ধী বনাম প্রদেশ কংগ্রেসের তাত্ত্বিক বিরোধে সরাসরি যোগ না-দিয়ে তিনি সচেতনভাবেই একটা নিরপেক্ষ অবস্থান নিতেন। এর সঙ্গে ছিলই নেহরু পরিবারের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠতা এবং গান্ধীবাদী রাজনীতিতে তাঁর স্থির বিশ্বাস, সবমিলিয়ে যা তাঁর ভবিষ্যতের পথ সুগম করেছিল। বিশেষত, প্রদেশ কংগ্রেসের অধিকাংশ সদস্যই যখন বিক্ষুব্ধ সুভাষের পাশে দাঁড়াচ্ছেন এবং জাতীয় দলের বিরাগভাজন হচ্ছেন, সেসময় এই অবস্থান বিধানচন্দ্রকে বিশেষভাবে হাইকমান্ডের ঘনিষ্ঠ করে তুলেছিল।

-- Advertisements --

[cky_video_placeholder_title]

তৎকালীন বাংলা, মুসলমান-প্রধান রাজ্য হলেও তার আর্থ-সামাজিক লাগামটা ছিল ইংরেজি-শিক্ষিত, উচ্চবর্ণের হিন্দু 'ভদ্রলোক'-দের হাতে। শুধু মুসলমান-ই নয়, সমাজের একটা বিরাট অংশ 'নিচু জাত' বলে শাসিত হত এই উচ্চবর্ণের হিন্দু ভদ্রলোকেদের দ্বারা। এরা জনসংখ্যার মাত্র ৬.৪ শতাংশ হলেও শিক্ষা থেকে শুরু করে চাকরি (সরকারি ও বেসরকারি উভয়ক্ষেত্রেই), সবেতেই একচ্ছত্র আধিপত্য উপভোগ করত। ছবিটা পাল্টাতে শুরু করে বিশ শতকের দ্বিতীয় দশক থেকে। সে সময় থেকেই শুরু হয় মুসলমান এবং 'নিচু জাত'-এর রাজনৈতিক ক্ষমতায়নের পালা।

কবিগুরু-সমীপে বিধানচন্দ্র রায়

১৯৩৭ সালের সাধারণ নির্বাচনের (সর্বসাধারণের ভোটাধিকার প্রতিষ্ঠিত হতে তখনও কিন্তু অনেক দেরি) পর সরকার প্রতিষ্ঠায় অগ্রণী ভূমিকা নেয় বাংলার মুসলমানেরা— প্রথমে ফজলুল হকের 'কৃষক প্রজা পার্টি'র ছত্রছায়ায় এবং পরে 'মুসলিম লিগ'-এর পতাকার নীচে। ফলে ১৯৩৮ সালে (এবং ১৯৩৯-এও) সুভাষচন্দ্র যখন কংগ্রেস সভাপতি নির্বাচিত হন, ততদিনে 'অ-বিভক্ত বাংলা'-র দৃঢ় ধারণাটিতে চ্যুতিরেখা দেখা দিতে শুরু করেছে। এমনকী স্বাধীনতার দু'মাস আগে পর্যন্তও বাংলার কোনও নেতা নিশ্চিতভাবে জানতেন না, এ রাজ্যের ভাগ্যে কী লেখা আছে।

মুসলিম লিগের দাবি ছিল— বাংলা বা তার বৃহত্তম অংশ (অবশ্যই কলকাতা-সহ) নবগঠিত পাকিস্তান রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত হোক। হিন্দু মহাসভা নিভু নিভু হয়েও লাগাতার সওয়াল করে চলেছিল সাম্প্রদায়িক বিভাজনের পক্ষে। সুভাষচন্দ্রের ভাই শরৎচন্দ্র বসু এবং মুসলিম লিগের প্রাক্তন প্রধান এইচ এস সুরাবর্দি অক্লান্তভাবে কাজ করে চলেছিলেন যাতে বাংলার হিন্দু-মুসলমান ঐক্য অক্ষুণ্ণ রেখে তাকে স্বাধীন রাজ্যের মর্যাদা দেওয়া যায়। আর এই সবকিছুর মধ্যে কংগ্রেস ছিল সবচেয়ে বেশি দিশাহীন। জাতীয় স্তরে সরকারিভাবে পাকিস্তানকে পৃথক রাষ্ট্র ঘোষণার বিরোধিতা করা কংগ্রেস, প্রকৃতপক্ষেই, বাংলায় কী অবস্থান নেবে, তা নিয়ে চরম দোলাচল এবং দ্বিধায় ভুগছিল।

-- Advertisements --

[cky_video_placeholder_title]

এতক্ষণ ধরে এতকিছু বলার কারণ হল, একটি মূলগত বিষয়ে পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ। কী সেই বিষয়? তা হল, পঞ্জাবে দেশভাগ যখন অনিবার্য, সেই একই সময়ে বাংলায় কিন্তু তা ততটা অনিবার্য ছিল না, বরং বেশ কিছু বিকল্প পথ খোলা ছিল। বাংলায় হিন্দু-মুসলমানের বৈরিতা চূড়ান্ত তিক্ততায় তখনও পৌঁছয়নি এবং সাম্প্রদায়িকতার শেকড়ও খুব গভীরে চারিয়ে যায়নি। বাংলা ভাষার প্রতি উভয় সম্প্রদায়ের প্রবল মমত্ববোধ এবং পারস্পরিক মেলামেশার ঐতিহ্যের প্রতি ভালবাসার টান— দুইই বেশ জোরালো ছিল বাংলায়। এখনও যে তা আছে, ২০২১-এর নির্বাচনের ফলাফলই তার সাক্ষ্য দিচ্ছে।

ফলে দ্রুত দেশভাগ নিশ্চিত করার উপায় হিসেবে মহম্মদ আলি জিন্নাকে একরকম জোর করেই বাংলায় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা লাগাতে হয় (১৯৪৬ সালের সেই কুখ্যাত দাঙ্গা)। স্বাধীনতা এবং দেশভাগের আগে পর্যন্ত বাংলায় কংগ্রেস যে রাজনৈতিক ক্ষমতা হস্তগত করতে পারেনি, তার আরও একটা বড় কারণ ছিল। সেটা হল, প্রদেশ কংগ্রেসের ক্ষমতাবান হিন্দু নেতৃত্বের মূল ঘাঁটিই ছিল পূর্ব পাকিস্তান। দেশভাগের পর এঁরা স্বাভাবিকভাবেই ছিন্নমূল এবং দিশেহারা হয়ে পড়লেন। ফলে নেহরু এবং জাতীয়স্তরের নেতারা যতই এই ভেবে সন্তুষ্ট থাকুন যে বাংলায় দাঙ্গা এবং উদ্বাস্তু সমস্যা পঞ্জাবের মতো মারাত্মক হয়নি, স্বাধীনতা-পরবর্তী প্রদেশ কংগ্রেস নেতারা কিন্তু সে সমস্যা সামাল দিতে যথেষ্ট বিচলিত এবং বেসামাল হয়ে পড়েছিলেন।

মহাকরণের সিঁড়িতে মুখ্যমন্ত্রী

বিধানচন্দ্রের পূর্বসুরী, বাংলার প্রথম মুখ্যমন্ত্রী প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ স্বয়ং ছিলেন পূর্ববঙ্গীয় এবং বাঙালি হিন্দুদের দেশভাগের গভীর যন্ত্রণাময় আবেগের শরিক। স্বাভাবিকভাবেই তাঁর কার্যকলাপে প্রদেশ কংগ্রেসের সবচেয়ে শক্তিশালী উপদল 'হুগলি'-র নেতারা খেপে উঠছিলেন। এর অনিবার্য ফলশ্রুতি হিসেবেই ঘটে যায় মুখ্যমন্ত্রী পদপ্রার্থী হয়ে বিধানচন্দ্রের মনোনয়ন। তিনি ছিলেন প্রবাসী বাঙালি, জন্ম-বেড়ে ওঠা বিহারে। ফলে এই অতি-সংকীর্ণ ঘটি-বাঙাল দ্বন্দ্ব যে তাঁকে প্রভাবিত করবে না, তা বলাই বাহুল্য। এরসঙ্গে ছিল নেহরুর প্রিয়পাত্র হবার সুবিধাও।

তবে একথাও উল্লেখ করতে চাইব যে, ঐতিহাসিক জয়া চট্টোপাধ্যায় বিধানচন্দ্রকে 'হাই সোসাইটি ডক্টর' বলে যে তকমাটি দিয়েছেন, তা হয়তো এক্ষেত্রে সর্বার্থে গ্রহণযোগ্য নয়। একথা ঠিক যে বাংলার তাবড় তাবড় ব্যক্তিত্ব এবং জাতীয় কংগ্রেসের প্রথম সারির নেতারা অনেকেই ছিলেন তাঁর রোগী। কিন্তু মুখ্যমন্ত্রী পদপ্রার্থী হওয়ার ক্ষেত্রে তার চেয়েও অনেক বেশি করে কাজ করেছিল নেহরুর ব্যক্তিগত পছন্দের বিষয়টি, যা কিনা পরে বিধানচন্দ্রকে বেশকিছুটা সমস্যায়ও ফেলেছিল।

-- Advertisements --

[cky_video_placeholder_title]

এখানে যে বিষয়টা তুলে ধরার, তা হল কংগ্রেসের কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের সিদ্ধান্তের বিপক্ষে দাঁড়ানো বিধানচন্দ্রের পক্ষে সম্ভব ছিল না, যদিও স্বভাবে তিনি কিঞ্চিৎ 'বৈপ্লবিক'ই ছিলেন। তার চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ হল, নেহরুর পরিকল্পনার সঙ্গে তাল রাখতে গিয়ে মাঝেমধ্যেই তাঁকে, রাজ্যের উন্নতিসাধন হচ্ছে না বুঝেও, স্রেফ অনুরোধে ঢেঁকি গিলতে হচ্ছিল। ফলে একদিকে যেমন 'দুর্গাপুর স্টিল প্লান্ট' তৈরি করে আসানসোল-দুর্গাপুর-রানিগঞ্জকে নিজের স্বপ্নের প্রজেক্ট 'ভারতের রুর' (Ruhr of India) হিসেবে গড়ে তুলতে পেরেছিলেন, অন্যদিকে তেমনই

আবার নেহরুর ‘ফ্রেট ইক্যুলাইজ়েশন’ নীতির চোঁয়াঢেঁকুর গিলতে গিয়ে পূর্বভারতের শিল্পবান্ধব অবস্থানের সুবিধে কিছুই নিতে পারেননি। কারণ, ১৯৫২ সালের এই নীতিতে সাফ বলা হয়েছিল, ভারতের যে কোনও অঞ্চলে কারখানা গড়ে তোলবার জন্য খনিজ পরিবহণ খরচে ভর্তুকি দেবে ভারত সরকার। কাজেই কখন, কোথায়, কোন কারখানা তৈরি হবে, সে ব্যাপারে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তও তাদের হাতেই থাকবে।

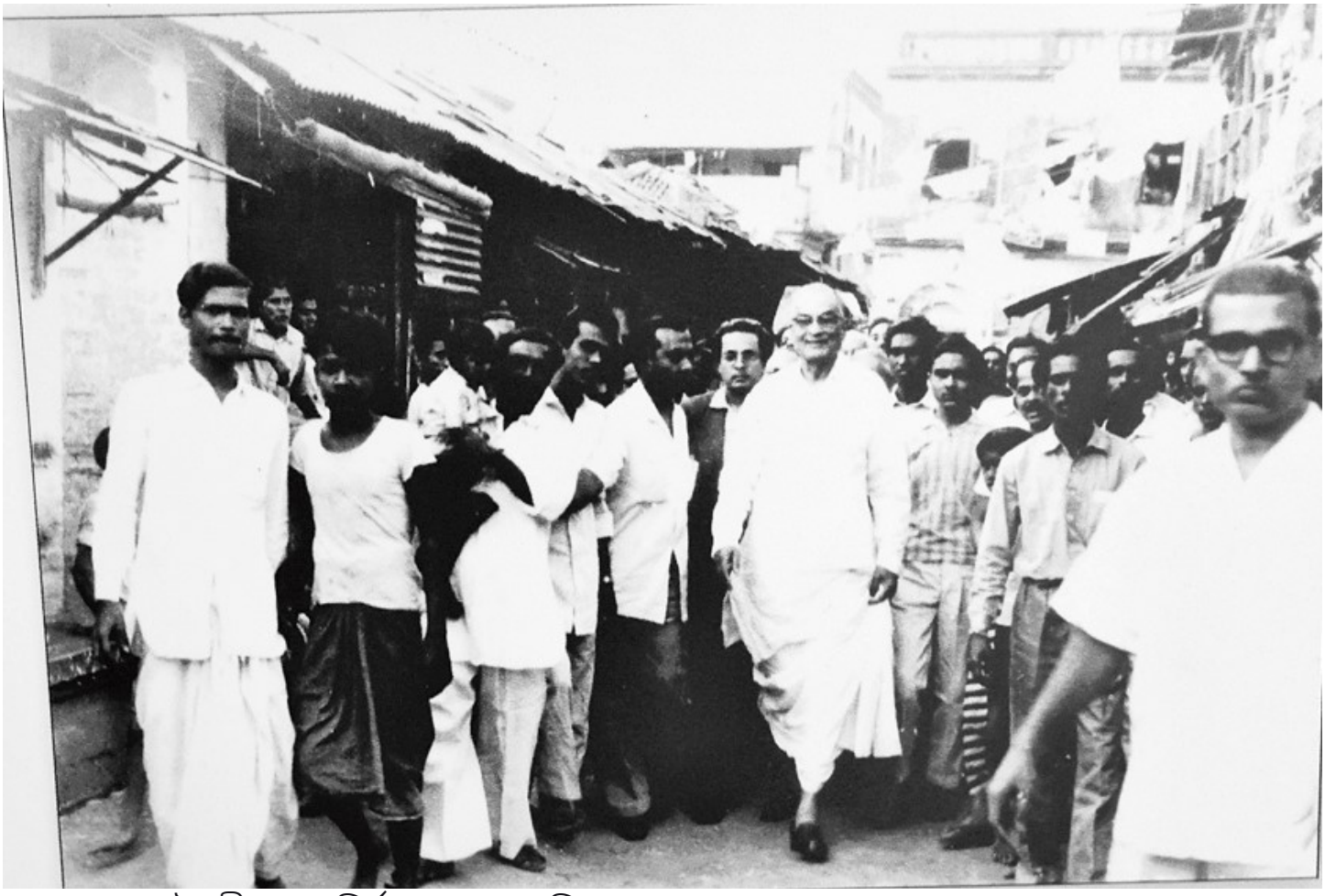

১৯৬২ সালে চৌরঙ্গী কেন্দ্রে নির্বাচনের প্রচারে বিধানচন্দ্র

ফলে বিধানচন্দ্র রায়ের আমল থেকেই ক্রমশ পশ্চিমবঙ্গ শিল্পক্ষেত্রে মহারাষ্ট্রের মতো রাজ্যগুলির কাছে পিছিয়ে পড়তে থাকে। তৎসত্ত্বেও বিধানচন্দ্র হার মানেননি। কেন্দ্রের কাছে নিজের বিরুদ্ধমত লাগাতার প্রকাশ করে গিয়েছেন (যা আজকের যুগে অকল্পনীয়) এবং নেহরু সরকারের কাছ থেকে বাংলার জন্য যথাসাধ্য আদায় করারও চেষ্টা করেছেন। এরই ফল, বিধান রায়ের হাতে তৈরি বাংলার দু’টি উল্লেখযোগ্য উপনগরী— কল্যাণী এবং বিধাননগর (আজকের সল্টলেক)। এছাড়াও অশোকনগর-হাবড়ায় বিধান রায় তৈরি করেন শহুরে সুযোগসুবিধাযুক্ত একের পর এক আবাসন, যেখানে বসবাসের সুযোগ পায় অসংখ্য উদ্বাস্তু পরিবার।

বস্তুত, মুখ্যমন্ত্রী বিধানচন্দ্র রায়ের সামনে সবচেয়ে বড় যে চ্যালেঞ্জ দেখা দিয়েছিল, তা নিঃসন্দেহে দেশভাগ-পরবর্তী উদ্বাস্তু সমস্যা। এ ব্যাপারে কেন্দ্রীয় সহযোগিতাও তিনি খুব একটা পাননি, কারণ নেহরু এবং সর্দার পটেল দু’জনেই তখন হিমশিম খাচ্ছেন পঞ্জাব থেকে স্বাধীনতা-পরবর্তী চার বছরে আগত ৭৩ লক্ষ হিন্দু এবং শিখ উদ্বাস্তুদের ধাক্কা সামলাতে। তার তুলনায় বাংলার হিন্দু-উদ্বাস্তুর সংখ্যাটা তাঁদের কাছে নগণ্য বলেই বোধ হয়েছিল । কিন্তু বাংলার আর্থ-সামাজিক পরিস্থিতি বিচার করলে বিষয়টা এত নগণ্য মোটেই ছিল না, কারণ পশ্চিমবাংলা আগে থেকেই ছিল ঘনবসতিপূর্ণ। তার ওপর ১৯৪৭ থেকে ১৯৫০-এর মধ্যে ২৫ লাখ উদ্বাস্তুর ঝক্কি সামলানো

মোটেই সহজ কাজ ছিল না। বিধানচন্দ্রের প্রয়াণের সময়ে (১৯৬২) সে সংখ্যা সাড়ে বিয়াল্লিশ লক্ষ ছাড়িয়ে গিয়েছে। ফলে পশ্চিমবঙ্গের সাড়ে তিন কোটি জনসংখ্যার মধ্যে সাড়ে বিয়াল্লিশ লক্ষই যে উদ্বাস্তু, একথা সরকারি রিপোর্ট দেখলেই প্রমাণিত হয়।

তবে সরকারি হিসেবই তো শেষ কথা নয়! প্রতিটি উদ্বাস্তু পরিবারের সঙ্গে তাঁদের আত্মীয়-বন্ধু-পরিজনের যে বিপুল সংখ্যা অভিবাসী হিসেবে হুড়মুড় করে পশ্চিমবাংলায় ঢুকে পড়ছিল, সেই জনবিস্ফোরণের হিসেব রাখা কোনও সরকারেরই কম্ম ছিল না। এই বাঙালি ভদ্রলোকের দল দরকারমতো পূর্ববঙ্গ-পশ্চিমবঙ্গ যাতায়াত করতেন, প্রয়োজনে দু'দিকেই মাথা গোঁজার ব্যবস্থা রাখতেন এবং গতায়াতের পথ সুগম করতে নানা বেআইনি পন্থার আশ্রয় নিতেও পিছপা হতেন না। ১৯৫১ সালের জনগণনা অনুযায়ী, দেশভাগের আগেই কলকাতা এবং তার আশপাশের এলাকায় প্রায় ২৫ লক্ষ উদ্বাস্তু এসে বসত শুরু করেছিলেন। কিন্তু নেহরুর মাথায় ছিল বাংলার সহিষ্ণুতা এবং মিশ্র সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের কথা। ফলে উদ্বাস্তু সমস্যা সমাধানের ব্যাপারেও তিনি বিধানচন্দ্রকে কোনওরকম সহানুভূতি দেখাননি।

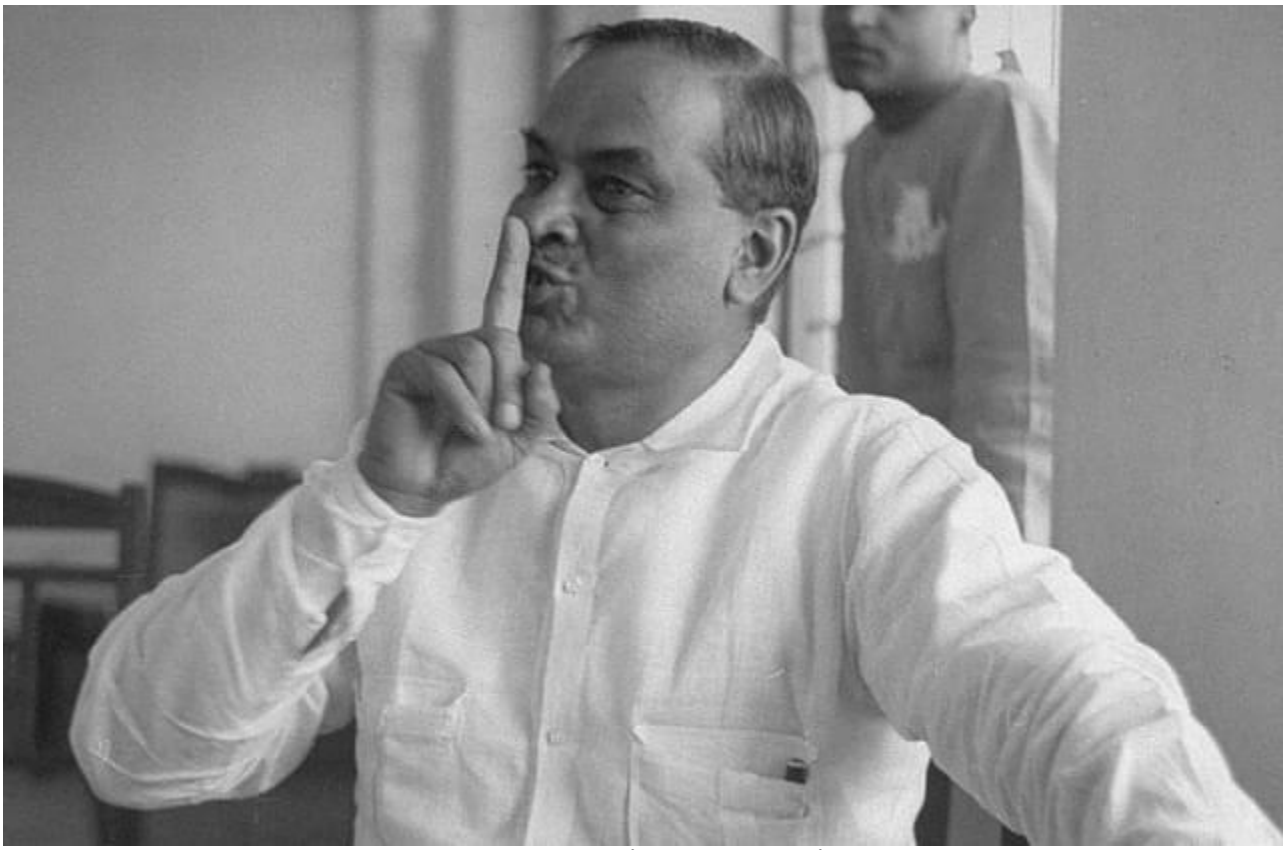

নেহরুর সঙ্গে ঘনিষ্ঠতার কারণে অনেকসময়ই তাঁর অনুরোধে ঢেঁকি গিলতে হয়েছে বিধানচন্দ্রকে

১৯৪৮ সালের ১ এপ্রিল, নিরুপায় বিধানচন্দ্র বাংলার মানুষকে উদ্দেশ্য করে বলেন, 'পূর্ব পাকিস্তান থেকে এই অভিনিষ্ক্রমণে উৎসাহ দিলে ফলাফল ভয়ানক হবে।' দিন পনেরো পরে তিনি সে বক্তব্য আরও ক্ষুরধার এবং স্পষ্ট করে বলেন, 'হিন্দুরা পূর্ব পাকিস্তান ছেড়ে আসবেন না। তাঁরা যদি এত বিপুল সংখ্যায় দেশ ছাড়তে থাকেন, তাহলে খুব খারাপ অবস্থায় পড়বেন এবং আমাদের পক্ষেও তাঁদের জন্য কোনওপ্রকার ব্যবস্থা করা অসম্ভব হয়ে পড়বে।' এ ধরনের মন্তব্য বিভাজনমূলক হলেও যেহেতু বিধান রায়ের সরকার পশ্চিম পাকিস্তানের উদ্বাস্তু-কল্যাণে যথাসাধ্য সাহায্য করছিল, তাই প্রতিবাদও হয়েছিল কম। যেটুকু হয়েছিল তা বিধানচন্দ্রকে হজম করতে হয়েছিল।

-- Advertisements --

[cky_video_placeholder_title]

পশ্চিমবাংলায় একটা ধর্মনিরপেক্ষ মেজাজ এবং বাতাবরণ তো অবশ্যই ছিল। যার ফলে আমরা দেখি, পূর্ব পাকিস্তানের ২৫ বছরের জীবদ্দশায় বাংলা থেকে মাত্র পনেরো লক্ষ মুসলমান সেখানে ফিরে যান। পঞ্জাব আর উত্তরপ্রদেশ থেকে পশ্চিম পাকিস্তানে ফেরত যাওয়া মুসলমানের সংখ্যা এর থেকে কয়েকগুণ বেশি। এদের মধ্যে কেউ কেউ আবার পশ্চিমবঙ্গেও চলে আসেন। ফলে কেন্দ্রীয় সরকার পশ্চিম পাকিস্তানে চলে যাওয়া মুসলমানদের ফেলে যাওয়া সম্পত্তির ৪৫ লক্ষ একর জমি অধিগ্রহণ করে উদ্বাস্তু হয়ে আসা হিন্দু ও শিখদের দিতে পেরেছিল। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গ তার দশভাগের একভাগও পারেনি।

কিন্তু পশ্চিমবাংলায় দুই সম্প্রদায়ের মধ্যেই ছিল কিছু অশান্তি-বাধানো, অসামাজিক কাজকর্মে লিপ্ত মানুষজন। তারা 'শত্রুপক্ষের সম্পত্তি' দখলের নামে লুটতরাজ, দাঙ্গাহাঙ্গামা চালিয়ে যাচ্ছিল। ক্রমশ উত্তপ্ত, বিস্ফোরক হচ্ছিল বাংলার পরিস্থিতি। কিন্তু সেই বিপজ্জনক বাস্তবতাকে লাগাতার অস্বীকার করে যান নেহরু এবং কংগ্রেস হাইকমান্ড। বিধানচন্দ্রকে চাপ দিতে থাকেন, যাতে তাঁর বক্তব্যে কোনওভাবেই উদ্বাস্তু সমস্যা নিয়ে কোনও আতঙ্ক না ছড়ায়। ফলে যা হবার তাই হয়।

বিরোধী দল কমিউনিস্ট পার্টির সদস্যদের সঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী বিধান রায়

১৯৪৯ সালে কংগ্রেস কলকাতার একটি গুরুত্বপূর্ণ উপনির্বাচনে হেরে যায়। অনিবার্যভাবেই সাধারণ মানুষের রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা একটা ধাক্কা খায়। অধৈর্য উদ্বাস্তুরা শহর এবং লাগোয়া এলাকায় যেসব ফাঁকা জমিজায়গা ছিল (ব্যক্তি-মালিকানাধীন এবং খাসজমি), সেগুলি জবরদখল করতে শুরু করে। বাংলায় তখন কমিউনিস্টদের উত্থানের সময়। ১৯৪৯ সালের জুলাই মাসে, নেহরুর কলকাতা সফরের সময় উদ্বাস্তুরা তাঁকে লক্ষ্য করে পাথর আর জুতো ছোড়ে। রাজনৈতিক সভায় বোমা বিস্ফোরণ হয়। চতুর্দিকে হিংসা, হানাহানি, নৃশংসতা। কিন্তু দিল্লি সরকার নিজেদের খিড়কিদুয়োর সামলাতেই ব্যস্ত।

এইরকম সমস্যাসঙ্কুল একটা সময়ে বিধানচন্দ্র রায় 'উদ্বাস্তুদের ছড়িয়ে দেওয়া'র নীতি ঘোষণা করলেন। ক্যাম্প থেকে, পার্ক থেকে, এমনকী ফুটপাথ থেকে উদ্বাস্তুদের তুলে নিয়ে গিয়ে পুনর্বাসন দেওয়া হতে লাগল রাঢ়বঙ্গের জেলাগুলিতে। কিন্তু নদীমাতৃক শস্যশ্যামল পূর্ব পাকিস্তানের মানুষ এই পুনর্বাসনকে ভাল চোখে দেখলেন না, কারণ রাঢ়বঙ্গের ভূপ্রকৃতি ছিল শুষ্ক, রুক্ষ এবং বন্ধুর। আর একদল উদ্বাস্তুকে বিধানচন্দ্র পুনর্বাসন দিলেন মধ্যভারতের দণ্ডকারণ্যে, আর একদলকে আন্দামানে। কোনও ক্ষেত্রেই তিনি সম্পূর্ণ সাফল্য তো পেলেনই না, উপরন্তু মূল্য চোকাতে হল বিস্তর। কিন্তু এতকিছু সত্ত্বেও বিধানচন্দ্রের ঘনিষ্ঠ 'জওহর' বাংলার দিকে ফিরে তাকালেন না। ফলে কেন্দ্র এবং রাজ্যের মধ্যে তখন থেকেই ফাটল প্রকট হতে শুরু করে, তার চরিত্র যতই

‘গণতান্ত্রিক’ হোক না কেন।

-- Advertisements --

[cky_video_placeholder_title]

অতিরিক্ত জনসংখ্যার চাপে দেখা দিতে থাকে খাদ্যসংকট। পূর্ব পাকিস্তান থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে কৃষিজমি কমে যাওয়ায় খাবারের আকাল বাড়তে থাকে। ১৯৫৯ সালের অগস্ট মাসে কমিউনিস্টদের নেতৃত্বে শুরু হয় ‘খাদ্য আন্দোলন।’ বাংলার ইতিহাসের মোড় ঘুরতে থাকে এই সময় থেকেই। তরুণ কমিউনিস্ট নেতা জ্যোতি বসু দাবি করেন, আশি শতাংশ বামপন্থীকে সরকারি মদতে খুন করা হয়েছে। বিধানসভা মুহুর্মুহূ রাজনৈতিক বিতর্কে, বিরোধে কেঁপে উঠতে থাকে। বিধানচন্দ্র কিন্তু অচঞ্চল থেকে কমিউনিস্টদের সহিংস প্রতিরোধ ও বিক্ষোভের মোকাবিলা করতে থাকেন। তাঁর আত্মপ্রত্যয়ে এতটুকু চিড় ধরে না।

১৯৬২ সালে সল্টলেক রিক্লেমেশন প্রজেক্টের সূচনা মুহূর্তে বিধান রায়

কংগ্রেস জমানার অতি-সাম্রাজ্যবাদী কলকাতা পুলিশ, যাঁরা ইংরেজিতে কথা না বললে উত্তর দিতেন না, এবং তাঁদের অধীনস্থ সাহেবি প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত মাউন্টেড পুলিশ ভয়ানক শাস্তির খাঁড়া নামিয়ে আনতে থাকে বামপন্থী প্রতিবাদীদের উপর। ১৯৫৩ সালের ‘এক পয়সা ট্রাম ভাড়া’ আন্দোলন এবং ১৯৫৪ সালের ‘শিক্ষক আন্দোলন’ কমিউনিস্টদের পায়ের তলার জমি অনেকখানি শক্ত করেছিল ঠিকই, কিন্তু পাশাপাশি বিধানচন্দ্রের কড়া দমননীতির কথাও ইতিহাসকে বিস্মৃত হতে দেয়নি। তবে শক্তিশালী বিরোধী হিসেবে কমিউনিস্ট পার্টির অবদানের কথা বিধানচন্দ্রকেও স্বীকার করতেই হয়েছিল। বিশেষত, জ্যোতি বসুর প্রতি তাঁর মুগ্ধতা এবং প্রশংসা তিনি কখনও গোপন করেননি।

কাজেই একথা ভেবে আশ্চর্য হবার কিছু নেই যে কংগ্রেস বিধানচন্দ্র রায়কে সাফল্যের সঙ্গে ভুলে যেতে পেরেছে এবং বাংলায় সেই দলটি স্বাভাবিক কারণেই আইসিইউ-তে পড়ে থাকা মরণাপন্ন রোগীর অবস্থায় এসে পৌঁছেছে। বিধানচন্দ্র রায়কে আদতে মনে রেখেছেন বাংলার বামপন্থীরাই। সম্ভবত একমাত্র তাঁরাই এখনও বিধান রায়কে যথার্থ অর্থেই ‘আধুনিক বাংলার রূপকার’ খেতাবের যোগ্য দাবিদার বলে মনে করেন।

*ছবি সৌজন্য: Telegraph India, Wikipedia, NDTV, Oldindianphotos এবং কলকাতা কথকতা